30 MAY 1993

প্রসঙ্গঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তন

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

একাত্তুর বছর আগের কথা। এই কার্জন হলেই ১৯২২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রথম বিশেষ সমাবর্তনে বৃটিশ বঙ্গের গভর্নর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর দি রাইট অনারেবল লরেন্স জন লুম্‌লে ডুভাস, দি আর্ল অব রোনাল্ডসেকে সম্মান-সূচক ডক্টর অব ল'জ উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। ডিগ্রী প্রদান করেছিলেন প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর পি, জে হার্টগ, কারণ চ্যান্সেলর স্বয়ং ছিলেন উপাধি গ্রহণকারী। ভাইস চ্যান্সেলর তার ভাষণ শুরু করেছিলেন এইভাবে— "When a University confers an honorary degree on a person of exceptional distinction, it is not infrequently said that it confers honour on itself," একজন অনন্যসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সম্মানসূচক উপাধি দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিজকেই সম্মানিত করে। ১৯২২ থেকে '৭৪ সাল পর্যন্ত বত্রিশ জন ব্যক্তিকে অনুরূপ উপাধি প্রদানকালে প্রায় এই ধরনের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক উপাধিপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকায় মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের নাম দেখে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করবেন। কোন অর্থে এ দু'জন 'Person of exceptional distinction' কিংবা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেনকট্‌রমন, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার, কবি ও দার্শনিক মুহাম্মদ ইকবাল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি নজরুল ইসলাম, চীন বিপ্লবের অন্যতম নেতা চৌ-এন-লাই এবং আরব বিশ্বের মহান নেতা জামাল আবদেল নাসেরের সমপর্যায়ের ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়। এ দুটো নামের সঙ্গে তো অনেক দুঃখ, যন্ত্রণার, দুর্দিনের স্মৃতি মনকে পীড়া দেয়। এ অন্য প্রসঙ্গ, এখানেই থাক। হার্টগ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং এর শৈশব অবস্থায় আর্ল অব রোনাল্ডসের উল্লেখযোগ্য এবং সুদূরপ্রসারী অবদানের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিষদ, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (বর্তমানে সিন্ডিকেট) এবং কোর্ট (বর্তমানে সিনেট) তাঁকে এই সম্মানসূচক উপাধি প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিনি বলেন, বৃটিশ পূর্ববঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাটি ছিল 'like the river side station of Goalundo which Eastern Bengal Railway tries in vain to fix on the map' —পদ্মার ভাঙনের শিকার গোয়ালন্দ ষ্টেশনের অবস্থানের মতো অনিশ্চিত। এবং তা নিশ্চিত করে তোলেন রোনাল্ডসে "it was left to you as the first chancellor to fix the headstone of the corner."

১৯৯৩তে এসে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালামকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি প্রদান উপলক্ষে তাঁদের ভাষণে 'exceptional destinction-এর অধিকারী ব্যক্তিকে সম্মান দানে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ নিজকেই সম্মানিত করেছে— অতীতের এই অনুভূতিই ব্যক্ত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং ভাইস চ্যান্সেলর। চ্যান্সেলরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন "আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই মনীষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।" ভাইস চ্যান্সেলর বলেছিলেন "আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর সালামকে সম্মানিত করতে পেরে আমরা নিজদেরকে ধন্য মনে করছি।" চ্যান্সেলর এবং প্রধানমন্ত্রী তার সুন্দর ভাষণে যথাযথভাবে প্রফেসর সালামের প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন— "প্রফেসর সালামের মনীষা, সাধনা, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার মৌলিক অবদান, দরিদ্র বিশ্বের দেশগুলোতে বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে ও বিজ্ঞানের জনহিতকর প্রয়োগে তার প্রয়াস পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যানুরাগী সমাজের নিকট সুবিদিত। তার সাধনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তিনি কেবল একটি দেশের নাগরিক নন, সকল দেশের নাগরিক, তিনি বিশ্ব নাগরিক। অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে সমগ্র মানব জাতিকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন।"

চ্যান্সেলর এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার ভাষণে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। একঃ বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহে 'উন্নয়ন ও অবক্ষয়ের পটভূমিতে' মানসিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা। অধ্যাপক সালামই এই প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করেছিলেন ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান সম্মেলনে— এ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে চ্যান্সেলর বলেন "সেই মানসিক বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানগত বিপ্লবেরই নামান্তর। তিন দশকের ব্যবধানে দরিদ্র দেশসমূহে জ্ঞানের জগতে বিপ্লবের প্রয়োজন আজ আরো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।" জ্ঞানচর্চাকে সবরকম জড়তা, স্থবিরতা, গোড়ামির কবল থেকে উদ্ধার করে পরিবর্তনশীল সমাজের উপযোগী, মানুষের কল্যাণমুখী পথে নিয়ে যেতে হবে— চ্যান্সেলরের বক্তব্যের মাধ্যমে এই বিশ্বাসই স্বীকৃতি পেয়েছে। সত্যিই জ্ঞান জগতে আজ বিপ্লবের প্রয়োজন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, কারণ একাগ্র জ্ঞানসাধনার পথ আজ কন্টকাকীর্ণ, জ্ঞানসাধক নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। প্রকৃত জ্ঞানসাধনার ফসল মুক্তবুদ্ধি। সেই মুক্তবুদ্ধি-প্রসূত কথা বলতে গেলেই চারপাশ থেকে নিষেধের, প্রতিবাদের খড়্গ উত্তোলিত হয়। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চার পাদপীঠ। সেখানে আজ জ্ঞানসাধনার পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। তিনটি অনুষদ, বারোটি বিভাগ, ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী, ৬০ জন শিক্ষক নিয়ে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু তা গত ৭২ বছরে কলেবরে বেড়ে গিয়েছে অনেকগুণ। ১১টি অনুষদ, ৪০টি বিভাগ, ৭টি ইন্সটিটিউট, প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থী, ১২শ' শিক্ষক নিয়ে আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এই growth বা প্রবৃদ্ধি quantitative, পরিমাণগত, অবয়বগত। সেই প্রথম বিশেষ সমাবর্তনে ভাইস চ্যান্সেলর হার্টগ যে কথা বলেছিলেন 'a university is great not by size alone, but by quality, by solid achievement---' স্বাধীনতা উত্তর কালে সেই solid achievement-এর একান্ত অভাব ঘটে গেছে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

এবারের বিশেষ সমাবর্তন ভাষণেও চ্যান্সেলর বাংলাদেশে গত কয়েক দশক ধরে বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে 'ভাটার কাল চলেছে' বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 'ভাটার কাল'-এর অবসান ঘটিয়ে জোয়ার আনার উৎসাহ উদ্যোগ কোথায়? জোয়ার আসার অনুকূল আবহাওয়াই বা কোথায়? মনে পড়ে, আশির দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে যুক্তরাষ্ট্রের উইড্রো উইলসন গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণা করতে যাওয়ার অনুমতি প্রদানের জন্য সরকারের সঙ্গে রীতিমত পত্রযুদ্ধ করতে হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে কোনমতেই বোঝানো যাচ্ছিলো না উইড্রো উইলসন সেন্টারে গবেষণার সুযোগ লাভ কত সম্মানজনক এবং দুর্লভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা অধ্যাপকরা জানেন অধ্যাপক সালামের সান্নিধ্যে টিয়েস্টে কাজ করতে যাওয়ার অনুমতির জন্য তাদের কতবার এক অফিস থেকে আর এক অফিসে দৌড়াতে হয়, কত বাধার সম্মুখীন হতে হয়। দুইঃ চ্যান্সেলর তাঁর ভাষণে আমাদের বুদ্ধিবাদী ঐতিহ্যের উল্লেখ করেন— 'আমাদের রয়েছে এক সমৃদ্ধ বুদ্ধিবাদী ঐতিহ্য। মহাপণ্ডিত শীলভদ্র ও দীপঙ্কর থেকে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ডঃ কুদরত-ই-খুদা পর্যন্ত আমাদের রয়েছে এক সমৃদ্ধ বুদ্ধিবাদী ঐতিহ্য।' আমাদের বুদ্ধিচর্চা ও জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে সুদূর অতীতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী অধ্যক্ষ শীলভদ্র এবং জ্ঞানের দীপশিখা নিয়ে তিব্বত অভিযাত্রী দীপঙ্করের সময়কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ধারাবাহিকতা তুলে ধরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সংস্কারমুক্ত উদার-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। এই ধারাবাহিকতার স্বীকৃতির ভেতর দিয়ে আমরা বাঙালী না বাংলাদেশী— এসব বিতর্ক, বাদানুবাদের উর্ধ্বে— বাঙালিত্বের ধারাবাহিকতাই আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দু'টি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দু'টিই বিশেষ সমাবর্তন— প্রথমটি ১৯৭৪ এবং দ্বিতীয়টি ১৯ বছর পর '৯৩ সালে। ১৯৭০-এর পর গত তেইশ বছরে শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রী প্রদানের জন্য কোন সমাবর্তন হয়নি— যা প্রতিবছরই নিয়মমাফিক হবার কথা। অথচ সমাবর্তন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের একটি একাডেমিক অনুষ্ঠান। সমাবর্তন না হওয়া একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। সমাবর্তন অনুষ্ঠিত না হবার পেছনে দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং এর অধিভুক্ত কলেজসমূহ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্তদের সংখ্যা এতো বেশি যে তা "আনম্যানেজেবল্", সামাল দেয়া সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৩-এর ২২শে ফেব্রুয়ারিতে। সেই সমাবর্তনে ৩৯৪ জন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে ৭৯ জন উপস্থিত ছিলেন। আশি থেকে নব্বই পর্যন্ত যে কোন বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হলে সে সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়াতো। অবশ্য সম্প্রতি এ্যফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার ফলে ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁধ থেকে এ সমস্যা নেমে গেছে। দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক অংগনের দলীয় বিরোধিতা সমাবর্তন পর্যন্ত সংক্রমিত হয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি সমাবর্তন অনুষ্ঠান ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে— এ ধরনের আশংকা থেকে মুক্ত না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়া সম্ভব নয়। সরকারী ও বিরোধী দল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনান্তে এ বিষয়ে একটা সমঝোতায় পৌছানোর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি।

বিশেষ সমাবর্তন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা বের করা হয়েছে এবং এর প্রথমেই রয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর বাণী। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রীর বাণী সম্পূর্ণভাবে একটি নতুন প্রথার প্রবর্তন। গণতন্ত্র শাসন সম্পর্কে সচেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই নতুনত্ব কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে তা বিবেচনার দাবি রাখে। তাছাড়া চ্যান্সেলর হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেখানে শিক্ষামন্ত্রীর বাণী প্রেরণ প্রটোকলসম্মত কিনা তাও ভেবে দেখবার বিষয়।